# মুসলমানদের সাহসী হতে হবে, হঠকারী নয়

## ড. মাহাথির মোহাম্মদ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর করুণায় আমরা ইসলামি সম্মেলন সংস্থার নেতৃবৃন্দ মুসলিম উম্মাহর ও ইসলামের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণের লক্ষ্যে আজ এখানে সমবেত হতে পেরেছি।

আমি প্রথমেই বলতে চাই, গোটা বিশ্ব আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চিতভাবেই ১৩০ কোটি মুসলমান, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ মানুষ আজ এ সম্মেলনের দিকে আশা নিয়ে চেয়ে আছেন। যদিও ইসলাম ও মুসলমানদের মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধারে আমাদের সদিচ্ছা ও সামর্থ্য সম্পর্কে তাদের সংশয় থাকতে পারে। আরো বেশি সংশয় থাকতে পারে তাদের ভাইবোনেরা আজ যে নিপীড়ন ও অবমাননার শিকার হচ্ছে তা থেকে তাদের মুক্ত করতে আমাদের সদিচ্ছা ও সামর্থ্য সম্পর্কে।

আমাদের লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের ঘটনাবলির হিসাব করতে আমি যাব না। আমাদের নিন্দুক ও নিপীড়কদের আরো একবার ধিক্কার জানাতেও আমি যাচ্ছি না। সেটা হবে অর্থহীন, কারণ আমরা তাদের নিন্দা জানালেই তারা তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করবে না। যদি আমাদের নিজেদের ও ইসলামের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদেরই কাজ করতে হবে।

সব মুসলিম দেশের সরকার আরো কাছাকাছি আসতে পারে, সব বিষয়ে না হলেও অন্তত কিছু প্রধান বিষয়ে, যেমন ফিলিস্তিন বিষয়ে একটা সাধারণ অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। আমরা সবাই মুসলমান। আমরা সবাই নিপীড়িত। আমরা লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হচ্ছি। কিন্তু আমরা যারা আল্লাহর রহমতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি তারা কখনোই সত্যিকার অর্থে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করিনি। অথচ মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য রক্ষায় ইসলাম আমাদের সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে।

শুধু যে আমাদের সরকারগুলোই বিভক্ত তা নয়, গোটা মুসলিম উম্মাহও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিভক্তি চলছে তো চলছেই। গত ১৪০০ বছরে ইসলামের ব্যাখ্যাকারীগণ, জ্ঞানীগণ, ওলামাগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এক, অভিন্ন ইসলামকে এতই ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখন এক ইসলামের মধ্যেই হাজারটা ধর্ম, আর সেগুলো একটা থেকে অন্যটা এতই আলাদা যে আমরা প্রায়শই পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং পরস্পরকে হত্যা করি। একটি অভিন্ন উম্মাহ থেকে আমরা বিভক্ত হয়েছি অসংখ্য গোত্রে, মাজহাবে, তরিকায়। প্রত্যেকেই দাবি করছি যে আমাদেরটাই সত্যিকারের ইসলাম। কিন্তু লক্ষই করতে পারি না যে, আমরা সত্যিকারের মুসলমান কি না তা নিয়ে আমাদের নিন্দুক ও নিপীড়কদের কোনোই মাথাব্যথা নেই। তাদের কাছে আমরা সবাই মুসলমান, এমন ধর্ম ও পয়গম্বরের অনুসারী, যাকে তারা সন্ত্রাসবাদের প্রবক্তা হিসেবে প্রচার করতে চায়। আমরা সবাই তাদের কসম-খাওয়া শত্রু। তারা আমাদের আক্রমণ করবে, হত্যা করবে, আমাদের দেশে দেশে আগ্রাসন চালাবে, শিয়া হোক, সুন্নি হোক, আলাবাইত বা দ্রুজ হোক, আমাদের সরকারগুলোকে উৎখাত করবে। আর আমরা নিজেরা পরস্পরকে আক্রমণ করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করার মধ্য দিয়ে তাদের সহযোগিতা করে চলেছি। কখনো কখনো তাদের কথামতো কাজ করছি, অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর হামলা চালানোর কাজে তাদের প্রক্সি হিসেবে কাজ করছি। আমরা আমাদের সরকারগুলোর পতন ঘটানোর চেষ্টা করি সহিংসতার মাধ্যমে, আমরা আমাদের দেশগুলোকে দুর্বল ও দরিদ্র করে ফেলছি। আমরা, ইসলামি দেশগুলোর সরকারসমূহ এবং মুসলিম

উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, পরস্পরকে ভাই বলে গ্রহণ করার ইসলামি নির্দেশ পুরোপুরি উপেক্ষা করেছি এবং এখনো করে চলেছি।

ইসলামের শিক্ষা আমরা উপেক্ষা করেছি– এটাই সব কথা নয়। আমাদের বলা হয়েছে ইকরা, জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়। প্রথম যুগের মুসলমানরা জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রিক ও ইসলাম-পূর্ব পণ্ডিতদের গ্রন্থাদি অনুবাদ ও পাঠ করার কাজে ব্রত হয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে বহু গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত-গবেষক, চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদের জন্ম হয়েছিল। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা ও ইসলাম পালনের পাশাপাশি তারা তাদের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। ফলে নিজেদের দেশে তারা সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছিলেন। এভাবে তারা নিজেদের জনগণকে রক্ষা করতেন এবং ইসলামের নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় জনগণ যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পশ্চাৎপদ ছিল, তখন আলোকপ্রাপ্ত মুসলমানরা এক মহান ইসলামি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, যে সভ্যতা ছিল মর্যাদাপূর্ণ, ক্ষমতাশালী। পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ তার কাছে ছিল নগণ্য। বিদেশী আগ্রাসন থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করার সামর্থ্য তার ছিল। ইউরোপীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য পুরোটাই এসে গিয়েছিল মুসলমানদের হাতে। সেসবের জন্য মুসলমান পণ্ডিতদের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসতে হতো ইউরোপীয়দের।

কিন্তু মহান ইসলামি সভ্যতা নির্মাণের মাঝপথে দেখা দিলেন ইসলামের নতুন ব্যাখ্যাকারীগণ। তারা এসে বললেন, মুসলমানের জ্ঞান অর্জন মানে শুধু ইসলাম ধর্ম পাঠ করা। বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির প্রতি তারা মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করতে লাগলেন। এভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়তে শুরু করলেন। এর ধারাবাহিকতায় মহান মুসলিম সভ্যতা ক্ষয়ে যেতে থাকল। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান না হলে ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়েই মুসলিম সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক নবজাগরণের সম্পর্ক ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে তারা বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল চোস্ত-পাজামা আর খাড়া টুপি ইসলামসম্মত কি না, ছাপযন্ত্রের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে কি না বা মসজিদগুলোকে আলোকিত করতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা ইসলামসম্মত হবে কি না এসব মামুলি প্রশ্ন নিয়ে। মুসলমানরা শিল্পবিপ্লব পুরোটাই মিস করেছে। তাদের এ অধঃগামিতা চলতে থাকে তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের বিদ্রোহের উসকানিতে ওসমানীয় শাসকদের পতন পর্যন্ত।

আমরা নতুন জাতি-রাষ্ট্র ছাড়াও পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেছি। এতেও আমরা বিভক্ত হয়েছি, কারণ আমরা যেসব রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী গড়ে তুলেছি, তাদের মধ্যে কেউ নিজেকে ইসলামের দাবিদার বলে ঘোষণা করে, অন্য দলের ইসলামকে নাকচ করে, ক্ষমতায় যেতে না পারলে গণতান্ত্রিক চর্চার ফলাফল মানে না, সহিংসতার আশ্রয় নেয়। এভাবে মুসলিম দেশগুলো অস্থিতিশীল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব মিলিয়ে গত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম সভ্যতা এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, এমন একটিও মুসলিম দেশ ছিল না যারা ইউরোপীয়দের কলোনিতে পরিণত হয়নি বা তাদের আধিপত্যের শিকার হয়নি। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুসলমানরা আর শক্তি ফিরে পায়নি। মুসলান রাষ্ট্রগুলো ছিল দুর্বল, অদক্ষভাবে পরিচালিত। সবসময় একটা বিপর্যস্ত অবস্থা চলেছে সেসব দেশে। মুসলমান ভূখণ্ডগুলোতে ইউরোপীয়রা যা চেয়েছে তাই করতে পেরেছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তারা ইহুদি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল সৃষ্টির জন্য মুসলমানদের ভূমি বরাদ্দ করেছে। বহুধাবিভক্ত মুসলমানরা বেলফোর ঘোষণা ও জায়নবাদী আগ্রাসন ঠেকাতে বস্তুত কিছুই করতে পারেনি।

আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, এসব কিছু সত্ত্বেও আমাদের জীবন আমাদের নিন্দুকদের চেয়ে ভালো। অনেকে মনে করেন, দারিদ্র্যই ইসলামসম্মত, দুঃখ-যন্ত্রণা ও নিপীড়ন ভোগ করা ইসলামসম্মত। ইহকাল আমাদের জন্য নয়। পরকালই আমাদের আসল ঠিকানা, আমাদের জন্য আছে আখেরাতে বেহেশতের সুখ। আমাদের শুধু ধর্মকর্ম করতে হবে, নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক পরতে হবে এবং একটা নির্দিষ্ট চেহারা ধারণ করতে হবে। আমাদের যেসব ভাইবোন নিপীড়িত হচ্ছে তাদের সাহায্য করতে আমাদের  দুর্বলতা, পশ্চাৎপদতা ও অক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছার অংশ; আখেরাতে বেহেশতের সুখ-শান্তি ভোগ করার আগে এই দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে। আমাদের এ নিয়তি মেনে নিতে হবে। আমাদের কিছু করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না।

কিন্তু এ কি সত্য যে, এটা আল্লাহরই ইচ্ছা? আমরা কিছুই করতে পারি না? সুরা আর্-রাদ-এর ১১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি ততক্ষণ কোনো সম্প্রদায়ের ভাগ্য পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করবে।

আমাদের সংখ্যা এখন ১৩০ কোটি। বিশ্বে সবচেয়ে বড় তেলের মজুদ আছে আমাদের। আমাদের আছে বিরাট সম্পদ। জাহিলিয়া যুগে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল আমরা তাদের মতো অশিক্ষিতও নই। আমরা বিশ্ব অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবস্থার হালফিল জানি। পৃথিবীর ১৮০টি দেশের মধ্যে ৫৭টিই আমরা নিয়ন্ত্রণ করি। আমাদের ভোটে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভেঙে যেতে পারে। তবুও জাহিলিয়া যুগে যে সৃল্পসংখ্যক মানুষ হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) তাদের নবী হিসেবে গ্রহণ করেছিল আমরা যেন তাদের চেয়েও বেশি অসহায়। কেন? আল্লাহর ইচ্ছায়? নাকি আমরা আমাদের ধর্মকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছি বলে? নাকি আমাদের ধর্মের সঠিক শিক্ষা মেনে চলতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলে? নাকি আমরা অনেক ভুল করেছি বলে?

উম্মাহকে রক্ষার প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে আমাদের ধর্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা প্রতিরক্ষার প্রতি জোর না দিয়ে জোর দিচ্ছি নবীর আমলে ব্যবহৃত অস্ত্রপাতির দিকে। ওইসব অস্ত্র আর ঘোড়া এখন আর আমাদের প্রতিরক্ষার কাজে লাগবে না। আমাদের দরকার বন্দুক, রকেট, বোমা ও যুদ্ধবিমান। দরকার ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধজাহাজ। কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের আখেরাতের জন্য কল্যাণজনক নয় বলে বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতির চর্চাকে নিরুৎসাহিত করেছি, তাই আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা আজ আমাদের নেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, আমাদের অস্ত্র কিনলে তা কিনতে হবে আমাদের নিন্দুক ও শত্রুদের কাছ থেকেই। কোরআনের অগভীর ব্যাখ্যার কারণেই এটা হয়েছে। নবীর সুন্নাহর মূল বিষয় ও কোরআনের নির্দেশকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে হিজরতের প্রথম শতকে ব্যবহৃত এর আঙ্গিক, প্রথা ও পন্থার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। আল্লাহর বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থের চেয়ে এর বাহ্যিক অর্থের ব্যাপারেই আমরা বেশি সচেতন। আমরা নবীর আদর্শের আক্ষরিক ব্যাখ্যার প্রতিই বেশি অনুগত। ইসলামসম্মত জীবনযাপনের সত্যিকার পন্থা ধরে নিয়ে সে সময়কার জীবনপ্রবাহের চর্চার মাধ্যমে সম্ভবত আমরা হিজরতের প্রথম শতককেই ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছি। কিন্তু এটা করা উচিত নয়। এর ফলে আমাদের যে পশ্চাৎপদতা ও দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, আমাদের নিন্দুক ও শত্রুরা আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তার সুযোগ নেবে। ইসলাম শুধু খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর জন্য নয়। ইসলাম সব সময়ের জন্য। সময় বদলে গেছে। আমরা পছন্দ করি বা না-ই করি, আমাদের বদলাতে হবে। আমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করার কথা বলছি না। বর্তমান বিশ্বের পটভূমিতে ইসলামি শিক্ষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ বর্তমান বিশ্ব হিজরতের প্রথম শতক থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। ইসলাম ধর্ম ভুল নয়। কিন্তু আমাদের ইসলামি চিন্তাবিদরা যেভাবে একে ব্যাখ্যা করছেন তা ভুল হতে পারে। কারণ তারা যতই শিক্ষিত হোন না কেন, তারা নবী নন। আমাদের নবী যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন আমরা ঠিক সে

ইসলামটিই বিশ্বাস করি কি না এবং তারই চর্চা করি কি না তা যাচাই করতে আমাদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষার কাছে ফিরে যেতে হবে। যখন আমাদের একের বিশ্বাস অন্যের থেকে এত ভিন্ন তখন আমরা সবাই শুদ্ধ ও সঠিক ইসলাম পালন করছি– এটা হতে পারে না।

আজ আমাদেরকে, পুরো মুসলিম উম্মাহকে ঘৃণা ও অমর্যাদার চোখে দেখা হচ্ছে। আমাদের ধর্ম আজ কালিমালিপ্ত। আমাদের পবিত্র স্থানগুলো অপবিত্র করা হয়েছে। দখল করে নেওয়া হয়েছে আমাদের ভূখণ্ড। আমাদের জনগণকে ক্ষুধায় মরতে হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হচ্ছে। আমাদের কোনো দেশই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন নয়। আমাদের ওপর যারা নির্যাতন চালাচ্ছে, তাদের অনেক ইচ্ছাই মেনে চলতে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা কীভাবে আচরণ করব, কীভাবে আমাদের দেশ চালাব, এমনকি কীভাবে চিন্তা করব– সে ব্যাপারেও তাদের ইচ্ছা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ যদি তারা আমাদের দেশে অভিযান চালায়, আমাদের জনগণ হত্যা করে কিংবা আমাদের গ্রাম ও শহরকে ধ্বংস করে তবে আমাদের করার তেমন কিছুই নেই। ইসলামই এসবের কারণ? নাকি আমাদের ধর্ম অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলে এটা হয়েছে?

এসব ব্যাপারে আমাদের একমাত্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ক্রুদ্ধ থেকে ক্রুদ্ধতর হওয়া। ক্রুদ্ধ মানুষ যুক্তির সঙ্গে চিন্তা করতে পারে না। আমাদের কিছু মানুষকে বিচারবুদ্ধিহীন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা গেছে। তারা তাদের ক্ষোভ ও হতাশা প্রশমনে হামলা চালিয়ে তাদের সমগোত্রীয় মুসলিমসহ যে কাউকে হত্যা করছে। তাদের সরকার তাদের বিরত রাখতে কিছুই করতে পারে না। শত্রুরা পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং সরকারগুলোর ওপর আরো চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে শত্রুদের নির্দেশিত পন্থা গ্রহণ করা ছাড়া সরকারগুলোর কোনো উপায় থাকছে না। এর ফলে এসব দেশের জনগণ ও উম্মাহ আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে এবং তাদের সরকারগুলোর পতন ঘটাচ্ছে। আরো বেশি নির্বিচার হামলার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রক্রিয়া নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। শত্রুদের ক্রোধকে আরো বাড়িয়ে দিতে এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসাকে প্রতিরোধ করতে হিসাবনিকাশ করেই এসব হামলা চালানো হচ্ছে। কিন্তু হামলায় কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। এতে মুসলমানরা আরো বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহ ও এর জনগণ আজ অসহায় বোধ করছে। সঠিকভাবে তারা কিছুই করতে পারে না– এ বোধ তাদের মধ্যে কাজ করছে। তারা বিশ্বাস করে, পরিস্থিতি শুধু আরো বেশি খারাপই হতে পারে। মুসলমানরা চিরকাল ইউরোপীয় ও ইহুদিদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। তারা চিরকাল দরিদ্র, পশ্চাৎপদ ও দুর্বল থাকবে। কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে, মুসলমানদের যথার্থ রাষ্ট্র হবে দরিদ্র ও বর্তমান বিশ্বে তারা নির্যাতিত হবে– এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু এটা কি সত্য যে, আমরা নিজেদের জন্য কিছুই করতে পারি না? ১৩০ কোটি জনগণ তাদের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র একদল শত্রুর অবমাননা ও নির্যাতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার কোনো শক্তিই পাচ্ছে না, এও কি সত্য হতে পারে? তারা কি শুধুই ক্রোধান্ধ হয়ে পাল্টা আঘাত হানতে জানে? আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠীকে আত্মঘাতী হয়ে মানুষ হত্যা করতে আহ্বান জানানো ছাড়া, আমাদের জনগণকে আরো গণহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া কি আর কোনো পথ নেই? আর কোনো পথ নেই এটা হতেই পারে না। ১৩০ কোটি মুসলমান কয়েক লাখ ইহুদিদের কাছে পরাজিত হতে পারে না। উপায় অবশ্যই আছে। আমরা যদি একটু ধীরেসুস্থে আমাদের দুর্বলতা ও সামর্থ্য খুঁজে এর ভিত্তিতে কৌশল গ্রহণ করি এবং পাল্টা ব্যবস্থা নেই, শুধু তাহলেই আমরা পথ খুঁজে পেতে পারি।

আমরা জানি, নবীজি তার প্রথম দিকের অনুসারীরা কুরাইশদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি পাল্টা হামলা চালিয়েছিলেন? না। তিনি কৌশলগত প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সেসব অনুসারীদের একটি খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর অনুসারীদের সমবেত করেন, প্রতিরক্ষা ক্ষমতা তৈরি করেন এবং তাঁর অনুসারীদের নিরাপত্তা

নিশ্চিত করেন। হুদায়বিয়ায় তিনি তাঁর সঙ্গী ও অনুসারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি অন্যায্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই চুক্তির ফলে যে শান্তি সূচিত হয় তার ফলে তিনি শক্তি সঞ্চার করেন এবং একপর্যায়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে ও সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এমনকি তখনো তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেননি। মক্কার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের অনেকে তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থকে পরিণত হন। এরা পরবর্তীকালে মুসলমানদের তাদের সব শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ আমাদের যে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন তা ব্যবহার করলে আমরা বুঝতে পারব, আমরা অযৌক্তিক আচরণ করছি। আমরা শুধু শত্রুদের আঘাত করি, কারণ তারা আমাদের আঘাত করে। এ ছাড়া আমরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছি তার কোনো উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নেই। নির্বোধের মতো আমরা প্রত্যাশা করি, তারা আত্মসমর্পণ করবে। আমরা অপ্রয়োজনে জীবন দেই, তাতে শত্রুদের আরো প্রতিশোধ নেওয়া ও আমাদের অবমাননা করার সুযোগ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজই হয় না। আমরা প্রকৃতপক্ষে খুবই শক্তিশালী। ১৩০ কোটি মানুষকে স্রেফ নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। ইউরোপীয়রা ১২ মিলিয়ন ইহুদিদের মধ্যে ৬ মিলিয়নকে হত্যা করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহুদিরাই তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পৃথিবী শাসন করছে। তারা যুদ্ধ করতে ও তাদের জন্য জীবন দিতে অন্যদের ব্যবহার করেছে। আমরা হয়তো তেমনটা করতে সক্ষম নই। আমরা ১৩০ কোটি মুসলমানের সবাইকে একতাবদ্ধ করতেও হয়তো সক্ষম নই। আমরা মুসলিম সরকারগুলোর মধ্যে ঐকমত্য আনতে সক্ষম নাও হতে পারি। কিন্তু আমরা যদি একত্রে কাজ করার জন্য উম্মাহ ও মুসলিম দেশগুলোর এক-তৃতীয়াংশকেও পাই, তবে এখনই আমরা কিছু করতে পারি। মনে করে দেখুন, নবী যখন মদিনায় যান তখন তাঁর প্রচুর অনুসারী ছিল না। কিন্তু সেখানে তিনি আনসার ও মুহাজিরদের একত্রিত করেছিলেন এবং একপর্যায়ে ইসলামকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এ একতা ছাড়াও আমাদের আরো যা অবশ্যই দরকার তা হলো আমাদের সম্পদ সম্পর্কে ধারণা। আমি ইতিমধ্যে আমাদের জনসংখ্যা ও তেলসম্পদের পরিমাণের উল্লেখ করেছি। বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে আমাদের প্রচুর প্রভাব রয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের যেটুকু দুর্বলতা আছে তা কাটিয়ে উঠতে এটা যথেষ্ট। আমরা আরো জানি, সব অমুসলিম আমাদের বিরুদ্ধে নয়। এমনকি ইহুদিদের মধ্যেও অনেকে আছেন যারা ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন না। প্রত্যেককে আমাদের শত্রু ভাবা উচিত হবে না। আমাদের তাদের মন জয় করতে হবে। শুধু অস্ত্রশস্ত্রে নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমাদের দেশগুলোকে স্থিতিশীল হতে হবে, ভালোভাবে পরিচালনা করতে হবে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে, শিল্প-প্রযুক্তির দিক থেকে এগিয়ে যেতে হবে। এতে সময় লাগবে বটে। কিন্তু এটা করা সম্ভব।

আমরা জানি, জাহিলীয় যুগের আরবরা নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিল শুধু এই কারণে যে, তারা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মানুষ। মহানবী তাদেরকে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বাণী শুনিয়েছিলেন এবং তারা পারস্পরিক ঘৃণা থেকে বেরিয়ে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, মহান ইসলামি সভ্যতা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করেছিল। আমরা কি বলতে পারি, জাহেল বা অজ্ঞরা যা করতে পেরেছিল, আমরা আধুনিক মুসলমানরা তা পারব না? যদি সবাই না পারি, আমাদের কিছু অংশ অবশ্যই পারব। যদি আমাদের মহান সভ্যতার পুনর্জাগরণ ঘটাতে নাও পারি, অন্তত মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারব। এমন নয় যে, করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সব মতপার্থক্য বিসর্জন দিতে হবে। আমাদের কেবল একটি বোঝাপড়ায় আসতে হবে, যাতে করে সর্বজনীন কতক স্বার্থের সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা একত্রে কাজ করতে পারি।

যেকোনো লড়াই-সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সম্মিলিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শৃঙ্খলা। জাবাল ওহুদের যুদ্ধে মহানবীর পরাজয় ঘটেছিল, কারণ তাঁর বাহিনীর যোদ্ধারা শৃঙ্খলা

ভেঙেছিল। আমরা জানি, এখনো আমরা নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে আগ্রহী নই, অনিয়ম আর অসমন্বিত কর্মকাণ্ড ত্যাগ করতে রাজি নই। আমাদের সাহসী হতে হবে, কিন্তু হঠকারী, অবিমৃষ্যকারী হলে চলবে না। আমাদের শুধু আখেরাতের পুরস্কারের কথা ভাবলেই চলবে না, ইহজগতেও আমাদের কর্মের ফলাফলের কথা ভাবতে হবে।

পবিত্র কোরআন আমাদের বলে, শত্রু যখন শান্তি স্থাপনে আগ্রহ দেখায় তখন আমাদের ইতিবাচক সাড়া দেওয়া উচিত। সত্য যে, আমাদের সঙ্গে যে চুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে তা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কিন্তু আমরা তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারি। হুদাইবিয়াতে মহানবীও তা-ই করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত তাঁরই জয় হয়েছিল।

আমি জানি, আমার এসব চিন্তাভাবনা জনপ্রিয় হবে না। ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধরা সরাসরি নাকচ করে দিতে চাইবেন। এমনকি তারা এসব ভাবনাচিন্তার প্রতি সমর্থনকারীদের খামোশ করে দিতে চাইবেন। তারা আরো বেশি করে তরুণ-তরুণীদের চূড়ান্ত শাহাদত বরণের জন্য পাঠাতে চাইবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এসব কোথায় গিয়ে ঠেকবে? এ পথে বিজয় আসবে না নিশ্চয়। গত ৫০ বছর ধরে ফিলিস্তিনের যুদ্ধে আমরা কোনো ফসল ঘরে তুলতে পারিনি। আমরা আসলে আমাদের পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছি।

শত্রুরা সম্ভবত এসব প্রস্তাব স্বাগত জানাবে আর আমরা বলব, পৃষ্ঠপোষকরা কাজ করছে আমাদের শত্রুদের পক্ষে। কিন্তু চিন্তা করুন, আমরা এমন এক জাতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি যারা চিন্তা করে। ২০০০ বছর ধরে তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন-হত্যাযজ্ঞ চলেছে, তারপরও তারা টিকে আছে পাল্টা আঘাত করে নয়, চিন্তার সাহায্যে। তারা সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, মানবাধিকার, গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে এগুলোর প্রচার করেছে যাতে করে তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনকে বিশ্ববাসীর কাছে অন্যায় বলে মনে হয়, যাতে করে তারা অন্যদের সঙ্গে সম-অধিকার ভোগ করতে পারে। এসব দিয়েই তারা আজ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং  তারা, এই ছোট্ট জনগোষ্ঠীটি এখন এক বিশ্বশক্তি হয়ে উঠেছে। আমরা শুধু বাহুবলে লড়াই করে তাদের সঙ্গে পেরে উঠব না, মগজও খাটাতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষমতার দম্ভে এবং দৃশ্যত সাফল্যের কারণে তারা উদ্ধত হয়ে উঠেছে। উদ্ধত লোকরা ক্রুদ্ধ লোকদের মতোই ভুল করবে, চিন্তা করতে ভুলে যাবে। ইতিমধ্যেই তারা ভুল করতে শুরু করেছে এবং আরো ভুল করবে। আমাদের জন্য এখন এবং ভবিষ্যতে সুযোগের জানালা খুলে যেতে পারে। এ সুযোগগুলো আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে আমাদের কর্মকাণ্ড শুধরাতে হবে। কথা ভালো জিনিস। কথার মাধ্যমে আমাদের ওপর যেসব অন্যায় করা হচ্ছে তা প্রকাশ করা যায় এবং হয়তো আমাদের পক্ষে কিছু সহানুভূতি এবং সমর্থনও আদায় করা যায়। এর মাধ্যমে আমাদের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি ও শত্রুকে মোকাবিলা করার সংকল্প আরো দৃঢ় হতে পারে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারি এবং আমাদের তা করা উচিত, কেননা শেষপর্যন্ত তিনিই স্থির করবেন আমাদের জয় না পরাজয় হবে। আমাদের প্রচেষ্টায় তাঁর আশির্বাদ ও সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন কি করবেন না, আমাদের বিজয়ী করবেন কি করবেন না তা নির্ধারিত হবে আমরা কী করব, কীভাবে করব তার দ্বারা। তিনি পবিত্র কোরআনের সুরা আর-রাদ-এর ১১ আয়াতে তা বলেই রেখেছেন।

শুরুতেই বলেছি, সমগ্র পৃথিবী আমাদের দিকে চেয়ে আছে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ইসলামি দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের এই সম্মেলনের ওপর তাদের আশা-ভরসা ন্যস্ত করেছে। তারা চায় না আমরা এখানে কথায় ও আকারে-ইঙ্গিতে শুধু আমাদের হতাশা আর ক্রোধ ব্যক্ত করি, শুধু আল্লাহর আশির্বাদ কামনা করি। তারা চায়, আমরা কিছু করি, বাস্তব পদক্ষেপ নেই। আমরা মুসলিম দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ বলতে পারি না যে, আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আমরা বলতে পারি না যে আমাদের ধর্ম ও আমাদের উম্মাহ যখন বিপন্ন তখনো আমাদের

পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আমরা জানি যে সম্ভব। অনেক কিছুই আমরা করতে পারি। আমাদের অনেক সম্পদ রয়েছে। আমাদের শুধু প্রয়োজন কাজ করার ইচ্ছাশক্তি। মুসলমান হিসেবে আমাদের ধর্মের নির্দেশনার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যা করা প্রয়োজন আমাদের তা করতে হবে সদিচ্ছার সঙ্গে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। আল্লাহ আমাদের অর্থাৎ নেতৃবৃন্দকে অন্যদের উপরে তোলেননি শুধু নিজেদের ক্ষমতা উপভোগের জন্য। যে ক্ষমতা আমরা ভোগ করছি তা আমাদের জনগণের জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য, ইসলামের জন্য। আমাদের অবশ্যই এ ক্ষমতাকে সুবিবেচনার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে, দূরদর্শিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। অবশেষে একদিন আমাদের জয় হবেই ইনশাআল্লাহ।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় ওআইসির এই দশম সম্মেলন থেকে আমরা যেন একটি নতুন ও ইতিবাচক দিক-নির্দেশনা লাভ করি। আমরা যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আর-রহমান, আর-রহিমের আশির্বাদ লাভ করি।

*মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় দশম ওআইসি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার ইংরেজি ভাষ্যের ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ।*

ড. মাহাথির মোহাম্মদ : মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী।